কী বার্তা দিল গাইবান্ধা আসনের উপনির্বাচন?

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক; ২২ অক্টোরর ২০২২

গাইবান্ধা-৫ এর উপনির্বাচনে একটি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেল। এই প্রথমবারের মতো আমাদের জানামতে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি সংসদীয় আসনের নির্বাচন – যদিও এটি ছিল একটি উপনির্বাচন – মাঝপথে স্থগিত করা হলো। এ সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই। আমরা দেখে আনন্দিত যে কমিশনের যেন বোধোদয় হয়েছে যে, যেনতেন প্রকারের নয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করাই কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলাদের ভাষায়: "আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাইরে অন্য কিছু ভাবার কোনো অবকাশ নেই এবং যে আইন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনের হাত বেঁধে দেয়, তা সাংবিধানিক মানদণ্ডও পূরণে ব্যর্থ হবে" (*কনস্টিটিউশনাল ল, তৃতীয় সংস্করণ*, পৃ. ৯৭৩)। এছাড়াও মনে হয় যেন কমিশনের উপলব্ধিতে এসেছে যে, নির্বাচন স্থগিত, নির্বাচনী ফলাফল বাতিল ও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদানের এখতিয়ার কমিশনের রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, গাইবান্ধার উপনির্বাচনটি এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন নিবাচন কমিশন, নিজের স্বীকারোক্তিতেই, চরম আস্থার সংকটে ভুগছে। বর্তমান কমিশনের নিয়োগের ব্যাপারে ছোট দলগুলোর কিং-মেকার হওয়ার অভিযোগ, তরিকত ফেডারেশনের আবারও একাধিক কমিশনারের নাম সফলভাবে প্রস্তাবের দাবি, অনুসন্ধান কমিটির পক্ষ থেকে কারা-কার-নাম প্রস্তাব করেছে তা প্রকাশে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা চূড়ান্ত দশজনের নাম প্রকাশে অনুসন্ধান কমিটির অস্বীকৃতি ইত্যাদি কারণে শুরু থেকেই সন্দেহ ও বিতর্ক নিয়ে আওয়াল কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। কুমিল্লার সিটি করপেরেশন নির্বাচনে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রয়োগে অপারগতা, এ নিয়ে পরবর্তীতে অসংলগ্ন বক্তব্য প্রদান এবং সেখানকার নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে এক ধরনের নাটকীয়তার কারণে কমিশনের ওপর আস্থাহীনতা চরম আকার ধারণ করে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মতামত উপেক্ষা করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ১৫০টি আসনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীতে নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলের মতামত পাল্টে দেওয়া, প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরীর মতো বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল ইভিএম কেনার সিদ্ধান্ত এবং ইভিএম ব্যবহার করে ভোট জালিয়তির অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারেনি এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করা ইত্যাদি কারণে কমিশনের আস্থাহীনতা এখন তলানীতে। প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞদের মতে ইভিএম ব্যবহার করে ডিজিটাল জালিয়তি করতে পারে মূলত নির্বাচন কমিশন, কমিশনের কর্মকর্তা, কারিগরি টিম এবং নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাগণ। এছাড়াও কমিশনের বিরুদ্ধেই সরকারি দলের প্রতি অনুগত হওয়ার গুরুতর অভিযোগ ব্যাপক। প্রসঙ্গত, আমরা আমাদেরকে একটি ইভিএম এবং এর সোর্সকোর্ড দেওয়ার লিখিত দাবি কমিশনকে জানিয়েছি, যাতে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এই ইভিএম ব্যবহার করার মাধ্যমে বেড়ায়ই ক্ষেত খেতে পারে।

এমনি প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের আটঘাট বেধে ভোটকক্ষে সিটি ক্যামেরা বসিয়ে গাইবান্ধা উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি উদ্‌ঘাটনের সর্বাত্মক চেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখলেও, এটি প্রশ্নের উদ্রেক না করে পারে না। কারণ অতীতে যে কোনো নির্বাচনের শেষে সাধারণত নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে অনিয়মের অভিযোগ তুললেও কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট সুষ্ঠু হওয়ার দাবি করা হত। যেমন, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর তখনকার ইসি সচিব মো. আলমগীর (তিনি বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার) বলেছিলেন, 'গণমাধ্যম থেকে যেটুকু দেখেছি এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন পেয়েছি, আমরা বলবো ভালো নির্বাচন হয়েছে।' অথচ নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার 'চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনিয়মের নির্বাচনের একটি মডেল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাই কমিশনের এবারকার ব্যতিক্রমী আচরণ সন্দেহের উদ্রেক করাই স্বাভাবিক। এছাড়াও গোপন কক্ষে 'ডাকাত' পড়ার আশঙ্কা এবং সরকারি কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্ভাব্য অসহযোগিতার কথা তো কমিশনের সদস্যদের জানার কথা, কারণ তাঁরা তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে আসেননি। তাই আগে থেকেই নির্বাচন বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিয়ে এগুলো ঘটতে দেওয়ার এবং ডাকাত ধরার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অসহযেগিতা উদ্‌ঘাটনের জন্য কমিশনকে উৎপেতে বসে থাকতে দেখে সন্দেহভাজন হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, অনিয়ম উদ্‌ঘাটন করে নির্বাচন বন্ধ করা নয়।

বিশেষ করে উপনির্বাচনটিতে সহজে বিজয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া, অনিয়মের জন্য লজ্জিত না হওয়ার পারবর্তে কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি অবিচার করার অতি জোরালো অভিযোগ তোলা এবং অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে অনেক প্রিসাইডং কর্মকর্তা থেকে সাদা কাগজে 'নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে' এমন প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার নজিরবিহীন পদক্ষেপ – এ সন্দেহকে ঘনীভূত না করে পারে না। এছাড়াও কমিশনের এমন কঠোরতার কারণে জাতীয় নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার আর প্রয়োজন নেই – একজন মন্ত্রীর এমন বক্তব্যও জনগণকে

সন্দিহান করতে বাধ্য। কারণ গাইবান্ধা উপনির্বাচনে কমিশনের পক্ষ থেকে কারচুপি উদ্‌ঘাটনের নজিরবিহীন প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতাসীনদের কমিশনের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ তোলা উভয় পক্ষের জন্যই 'উইন-উইন' – এর মাধ্যমে আউয়াল কমিশন যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এবং তারা যে ক্ষমতাসীনদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয় তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আশা করি বিষয়টি কাকতালীয়। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে এ নাটকে প্রযোজকের কূটবুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কারণ এর মাধ্যমে একই ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গাইবান্ধার উপনির্বাচনের পর গণমাধ্যমের সামনে প্রদত্ত বক্তব্যে কমিশন কয়েকটি বিষয়ে আবারও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। প্রথমত, তারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে যে ইভিএম নিয়ে একমাত্র সমস্যা হলো ভোটের গোপন কক্ষে ডাকাতের উপস্থিতি। এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে সুরম্য ভবনে স্যুটকোট পরে বসে থাকা এবং ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রযুক্তিগতভাবে এ দুর্বল যন্ত্রটি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ গোপনে যে ভোটের ফলাফল বদলে দেওয়া সম্ভব তা সুকৌশলে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে, ভোটে কারচুপির মোক্ষম সমাধান হলো ভোটকক্ষে সিসি ক্যামেরা। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে যেখানে অন্তত ৪৫ হাজার কেন্দ্র থাকবে এবং নির্বাচনী কক্ষ হবে কয়েক লক্ষ, সেখানে কমিশনের পক্ষ থেকে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নির্ধারণ করার আশা কল্পনাকেও হার মানায়।

লক্ষণীয় যে, গাইবান্ধা উপনির্বাচনে অনিয়মের জন্য কমিশন নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে, যেগুলো নির্বাচনী অপরাধ। আরপিও'র ধারা ৮১(১)(চ), ৮১(২), ৮৩(১), ৮৪, ৮৫ ও ৮৬ অনুযায়ী এগুলো শাস্তিযোগ্য নির্বাচনী অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ, আরপিও'র ৮৬ ধারা অনুযায়ী, "যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।" এখন দেখার বিষয় কমিশন অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে কিনা, যা তারা অতীতে করেনি। এর মাধ্যমেই তাদের কঠোরতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

গাইবান্ধার উপনির্বাচন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বয়ে আনল। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার না চাইলে সামান্য একটি উপনির্বাচনেও কমিশনের পক্ষে তার সুষ্ঠু নির্বাচনের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের অস্ত্রভান্ডারে থাকা 'নিউক্লিয়ার অপশান' ব্যবহার করে কারচুপির ও বিতর্কিত নির্বাচন ঠেকাতে পারে। তারা নির্বাচন স্থগিত অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অস্বীকৃতি জানাতে পারে এবং নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ সরকার না চাইলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে না, তবে আমাদের উচ্চ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত 'অন্তর্নিহিত' ক্ষমতা ব্যবহার করে, কমিশন নির্বাচন স্থগিত ও নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারে [*নূর হোসেন বনাম মো. নজরুল ইসলাম* মামলার, ৫ বিএলসি (এডি) (২০০০)]।

গাইবান্ধার উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আবারও প্রমাণিত হলো যে, দলীয় সরকারের অধীনে একটি সাধারণ উপনির্বাচনও – যার মাধ্যমে ক্ষমতার রদবদল হবে না – কমিশনের পক্ষে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হলো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে সীমাহীন দলীয়করণ। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে এমনকি নির্বাচন কমিশনেরও দলীয়করণ হয়।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১১টি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে চারটি হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং সেগুলোতে ক্ষমতার রদবদল হয়েছে। এগুলো দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অন্য সাতটি নির্বাচন হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে, যার দুটি ছিল একতরফা এবং এগুলো কোনো নির্বাচনই ছিল না, কারণ নির্বাচন মানেই বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের-সহ সাতটি নির্বাচনেই ছিল বিতর্কিত ও একতরফা, এমনকি কোনো কোনোটিতে চরম জালিয়াতির অভিযোগও উঠেছিল। এগুলো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অর্থাৎ আমাদের অতীতের এবং গাইবান্ধার উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতা বলে যে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন সম্ভব নয়।

তাই গাইবান্ধা উপনির্বাচন থেকে বার্তা হলো যে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে হলে কমিশনকে তাদের হাতে থাকা নিউক্লিয়ার অপশান আবারও ব্যবহার করতে হবে – নির্বাচন বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষমতা কমিশনের থাকলেও তার ব্যবহার কারো কাম্যও নয়; জনগণের আকাঙ্ক্ষা সুষ্ঠু নির্বাচন। তাই জাতীয় নির্বাচন স্থগিতের সম্ভাবনা এড়াতে হলে নির্বাচন কমিশনকে এখনই সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে বলতে হবে যে, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে, তা না হলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচনের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট পালন করা সম্ভব হবে না। সংসদে ব্যাপক

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীনরা অতি সহজেই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। একইসঙ্গে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্বল ও জালিয়াতির যন্ত্র ইভিএম ব্যবহার থেকে কমিশনকে সরে আসতে হবে। এতে বর্তমান অর্থনৈতিক দুঃসময়ে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া ইভিএম কেনার ব্যাপারে অতীতে যে সকল অনিয়ম ও বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে তাও এড়ানো যাবে।

পরিশেষে, আমরা আবারও আউয়াল কমিশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তবে আমরা আশা করতে চাই যে, গাইবান্ধা-৫ আসনে কমিশন যা করেছে তা কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা ফেরানোর কোনো বৃহত্তর প্লটের অংশ নয়। তবে ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়, তেমনিভাবে নির্বাচন কমিশনের আমাদের ভোটাধিকার হরণের একের একের পর এক অপচেষ্টার কারণে আমরা সন্দিহান না হয়ে পারি না। আমরা আরও আশা করতে চাই যে, গাইবান্ধা উপনির্বাচনে কমিশনের প্রদর্শিত কঠোরতা 'টু-লিটল-টু-লেইট' নয়! তা অবশ্য বহুলাংশে নির্ভর করবে এ থেকে তারা কী শিক্ষা নেয় এবং কী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

নিবন্ধটি ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতকৃত